দ্বিতীয় মৃত্যুর পর

দ্বিতীয় মৃত্যুর পর

মুহাম্মদ ফজলুল হক

স্বরবর্ণ

দ্বিতীয় মৃত্যুর পর
মুহাম্মদ ফজলুল হক

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০২১

প্রকাশক
স্বরবর্ণ
৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭৮৭-০০৭০৩০
Email : info.shoroborno@gmail.com

পরিবেশক
মাকতাবাতুল হাসান

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
quickkcart.com

প্রচ্ছদ
আখতারুজ্জামান

মুদ্রণ
শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা

মূল্য
১৩৫ টাকা

©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

Ditieo Mrittur Por By Mohammod Fazlul Haque, Published by : Sohroborno, 1st Edition : March 2021, Price Tk. 135, ISBN : 978-984-8012-70-3

উৎসর্গ

আমার বড় ভাই

মাওলানা হারুন-অর-রশিদকে, যিনি আমাদের মাথার ওপর কৈশোর-যৌবনের অনেকখানি পথ নির্ভরতার ছাতা ধরে রেখেছিলেন

এবং আমার বড় ভাবি

মোছা. দেলোয়ারা বেগম (হাসি) যিনি হেসে হেসেই আমাদের সকল উৎপাত সয়েছেন।

লেখকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। ফেসবুক, টুইটার এলেও সাধারণের নাগালে আসেনি। তবে ক্যামেরাবিহীন মোবাইল মানুষের জীবনের চালচিত্র পালটে দিচ্ছে।

সেই সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ঘটনার ছায়া অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত হয়। অন্য একটি নামে একটি পত্রিকার ঈদসংখ্যায় তা ছাপাও হয়। ইচ্ছে করলেই সামান্য একটু এডিট করে লেখাটিকে এই সময়ের ফেসবুক, টুইটারের আদলে নিয়ে আসা যেত। কিন্তু তা ইচ্ছে করেই আনা হয়নি। পাঠকের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী সংস্করণে তা বিবেচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। তবে তা উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মানসিক বিবর্তনে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

আমাদের চারপাশেই ছড়িয়ে আছে বিনাশের মায়াবী হাতছানি। বিশেষ করে আমাদের তরুণ প্রজন্মের অনেককেই এই মায়াবী হাতছানি প্রলুব্ধ করছে। তাদের মনের উগ্র বাসনার পাগলা ঘোড়াকে লাগাম পরাতে পারে ধর্মীয় অনুশাসন। কিন্তু ভোগবাদিতার মোহে অনেকেই ধর্মীয় অনুশীলনকে গুরুত্ব দেওয়া থেকে বিরত থাকে। ফলাফল, বিনাশের অতল গহিনে নিজেকে হারিয়ে ফেলা।

এ উপন্যাসে বিনাশের দিকে এগিয়ে যাওয়া নায়ক-নায়িকার মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের মানচিত্র আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের ধর্মীয় বোধহীন উগ্র বাসনা তাদের জীবনের কী পরিণতি দিয়েছে, তা পাঠক উপন্যাসটি পড়লেই জানতে পারবেন।

উপন্যাসে আমি কাহিনি বর্ণনার চেয়ে চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বেশি মনোযোগ দিই। আমার ধারণা এতে পাঠক সহজেই চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন। তবে কতটুকু সফলভাবে এ কাজটি আমি করতে পেরেছি তার বিচারের ভার পাঠকের হাতে।

পরিশেষে **স্বরবর্ণ** কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি উপন্যাসটি প্রকাশ করে সর্বসাধারণকে পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

মুহাম্মদ ফজলুল হক
সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ
ত্রিশাল মহিলা ডিগ্রি কলেজ
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

আসামি মিনহাজ আহমেদ হাজির...।

ডান্ডাবেড়ি পরা আসামি মিনহাজ পুলিশি প্রহরায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল।

আদালতভরতি উৎসুক জনতা। পিনপতন নীরবতায় আসামি মিনহাজের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। জনতার সামনের সারিতে মিনহাজের পরিবারের সদস্যরা বুকভাঙা আকুতি নিয়ে তাকিয়ে আছে। মিনহাজের আম্মা কাঁদছেন। আম্মার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানি। তার একমাত্র বোন চোখের পানিতে গাল ভাসিয়ে ভাইয়ের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। মিনহাজ পাথরের মতো শক্ত হয়ে নিথর দৃষ্টিতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

চাঞ্চল্যকর তামান্না হত্যামামলার রায় হবে আজ। অভিযুক্ত একমাত্র আসামি মিনহাজ আহমেদ, সাং-নাওডাঙ্গা, থানা-গৌরীপুর, জেলা-ময়মনসিংহ। মামলার চার্জশিটে উল্লেখ আছে, অভিযুক্ত আসামি মিনহাজ আহমেদ রাজপথে, প্রকাশ্য দিবালোকে জনতার চোখের সামনে ময়মনসিংহের নান্দাইল থানার সংগ্রামকেলি নিবাসী তামান্না সুলতানাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। আসামি হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে নিজেই ময়মনসিংহের কোতোয়ালি থানায় রক্তাক্ত ছুরিসহ আত্মসমর্পণ করে এবং হত্যাকাণ্ডের স্বীকারোক্তিসহ খুনের মোটিভ সম্পর্কে আদ্যোপান্ত সমস্ত কিছুই অকপটে স্বীকার করে। তামান্না হত্যামামলা চাঞ্চল্যকর হলেও ঘোরপ্যাঁচহীন মামলা ও আসামি মিনহাজ আহমেদ শুরু থেকেই বলে আসছে, নিজেকে সামলাতে না পেরে সে তার প্রণয়িনী তামান্নাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। সে অপরাধী। খুনের শাস্তি তার প্রাপ্য। মাননীয় আদালত যে রায় দেবেন, তাই সে মাথা পেতে নেবে। আসামি থানায়, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দিতে এবং জজ সাহেবের কাছে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছে। সরকারি উকিলের জেরায়ও একই কথা বলেছে। এমনকি আসামি আইনি লড়াইয়ের জন্য কোনো উকিলও নিয়োগ করেনি। এজন্যই তামান্না হত্যামামলা আলোচিত, কিন্তু রহস্যহীন সাদামাটা একটা মামলা। এ মামলায় আসামির শাস্তি অবধারিত। যা একটু রহস্য আছে, তা কেবল শাস্তির মাত্রা নিয়ে। আসামির ফাঁসি হবে না জেল হবে, তা নিয়ে।

কিন্তু যতই সাদামাটা হোক, আদালতের নিজস্ব একটা প্রক্রিয়া আছে। চাইলেই কাউকে ধরে যখন-তখন ফাঁসিতে লটকিয়ে দেওয়া যায় না। সবগুলো আইনি ধাপ পেরিয়েই রায় দিতে হয়। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো রহস্য না থাকাতে এবং প্রতিপক্ষ উকিলদের সময় প্রার্থনার কোনো সুযোগ না থাকায় বেশ তাড়াতাড়িই রায় ঘোষণা হতে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও এক বছর পেরিয়ে গেছে।

গত তারিখটা ছিল শুনানির শেষ দিন। সরকার পক্ষের উকিল সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ তুলে ধরে তার বক্তব্য আদালতে উপস্থাপন করেন। যদিও আসামি নিজেই এখানে প্রকৃত সাক্ষী। কিন্তু সরকারি উকিল তেমন জোশের সঙ্গে তার বক্তব্য দিতে পারেনি। আসামির উদ্দেশেও তেমন জঘন্য কোনো বিশেষণ প্রয়োগ করেনি। সরকারি উকিল তার ভাষণের এক পর্যায়ে বলে, মাননীয় আদালত, আসামি নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি তামান্না সুলতানাকে প্রকাশ্য রাজপথে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন। তিনি এও বলেছেন, তার প্রণয়িনী তামান্না সুলতানার প্রতারণা তাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে এবং এই প্রতিহিংসাজাত আবেগকে সামলাতে না পেরেই তিনি পাগলের মতো উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে তামান্না সুলতানাকে খুন করেন। মাননীয় আদালত, আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা মানুষ, বন্য কোনো জন্তু নই। লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি রিপুর ছোবলে মানুষ আক্রান্ত হবেই। এইসব রিপুর তাড়নাকে প্রশমিত করে মনুষ্য সমাজে বসবাস করার নামই সভ্যতা। এর নামই মনুষ্যত্ব। কিন্তু আসামি মিনহাজ আহমেদ বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্ব হারিয়ে পাশবিকতাকে গ্রহণ করেছেন। তিনি মানবতার বিপক্ষে, ধর্মের বিপক্ষে, সভ্যতার বিপক্ষে অবস্থান করে নিজের পশুত্বকে লালন করেছেন এবং হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ করে মানবতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। মাননীয় আদালত, তামান্না সুলতানার দ্বারা আসামি মিনহাজ আহমেদ যদি প্রতারিত হয়েও থাকেন, তথাপি আমরা মিনহাজ আহমেদের পাশবিকতাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতে পারি না। মানুষ যত অপরাধই করুক, যত প্রতারণাই করুক, আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে নির্যাতিত বা প্রতারক কাউকে খুন করার অধিকার আইন দেয়নি। ধর্মও দেয়নি। একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া। আর যেহেতু নিহত তামান্না সুলতানার দ্বারা আসামি মিনহাজ আহমেদের জীবনের কোনো আশঙ্কা ছিল না এবং একমাত্র প্রণয়িনী ছাড়া নিহত তামান্না সুলতানার সঙ্গে বৈধ কোনো সম্পর্কই ছিল না সেজন্য এই হত্যাকাণ্ডকে পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছাড়া অন্য কোনো নামে অভিহিত করার সুযোগ নেই। আসামি তার

স্বীকারোক্তিতে অনেকবার বলেছেন, তিনি তামান্না সুলতানার কাছ থেকে প্রতারিত হয়েছেন। আমরা যদি আসামির বক্তব্যকে সত্য বলে ধরেই নিই, তাহলেও তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই। মামলার নথিপত্র ঘেঁটে আমরা দেখেছি, তামান্না সুলতানা তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একাকিত্ব ঘুচাতে মোবাইল ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসামির সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন আসামি মিনহাজ আহমেদ সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ না করে তামান্নার সঙ্গে নিজেকে জড়ালেন কেন? যাকে দেখেননি, যার সম্পর্কে কিছু জানেন না, তাকে নিয়ে তিনি কেন স্বপ্নের সৌধ নির্মাণ করবেন? তদুপরি আসামি মূর্খও নন, নাবালকও নন। কীসের লোভে তিনি কোনো কিছুই পরখ না করে তামান্না সুলতানার প্রতি মোহান্ধ হলেন? অর্থাৎ এই অনৈতিক সম্পর্কের দায় কেবল নিহত তামান্না সুলতানার প্রতি আরোপ করাটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। আসামি মিনহাজ আহমেদ এর দায় থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না।

মাননীয় আদালত, সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং আসামির স্বীকারোক্তি এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে যে, আসামি মিনহাজ আহমেদ তামান্না সুলতানাকে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে একাই হত্যা করেছেন। আশা করি এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। এখন প্রশ্ন, এই হত্যাকাণ্ড কী পূর্বপরিকল্পিত নাকি আত্মরক্ষার্থে বা উত্তেজনার বশে সংঘটিত হয়েছে। মাননীয় আদালত, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, নিহত তামান্না সুলতানার পক্ষ থেকে আসামির জীবনাশঙ্কার কোনো সম্ভবনাই ছিল না। সুতরাং আত্মরক্ষার্থে খুন করার কোনো প্রশ্নই আসে না। আর সাময়িক উত্তেজনার বশেও এই হত্যাকাণ্ড ঘটেনি। এরকমটি ঘটলে একজন সুশিক্ষিত চাকুরে যুবকের কাছে ধারালো ছুরি থাকার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু ময়নাতদন্ত থেকে শুরু করে আসামির নিজ মুখের স্বীকারোক্তি এ কথাই প্রমাণ করেছে যে, নিহত তামান্না সুলতানাকে হত্যা করা হয়েছে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে। এখন প্রশ্ন, এই ধারালো অস্ত্র আসল কোত্থেকে? উত্তর একটাই আসামি মিনহাজ আহমেদ এই অস্ত্র গোপনে বহন করে নিয়ে এসেছেন। কেন? তামান্না সুলতানাকে খুন করতে। অর্থাৎ আসামি খুন করার উদ্দেশ্য নিয়েই তামান্না সুলতানার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই এই হত্যাকাণ্ড পূর্বপরিকল্পিত। আসামি মিনহাজ আহমেদ অনুতাপদগ্ধ হয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন এবং শাস্তি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণের কথাও বলেছেন। আসামির

এই বোধোদয় হয়ে থাকলে ভালো, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আদালতের অনুকম্পা পাওয়ার আশায় আসামির এটি একটি কৌশলও হতে পারে। মাননীয় আদালত, আসামির প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমিও সমবেদনা জানাতে পারি। কিন্তু আমাদের আইনের ভাষাতেই কথা বলতে হবে। এখানে ব্যক্তিগত সমবেদনার কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। তাই সুস্থ-সুন্দর সমাজ গঠনের প্রয়োজনে, মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ বিকাশের স্বার্থে, সমাজ থেকে অনৈতিক সম্পর্কের উচ্ছেদকল্পে বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মোতাবেক, এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা আসামি মিনহাজ আহমেদের শাস্তি দাবি করছি। দ্যাটস অল ইউর অনার।

সরকারি উকিল তার আসনে যখন বসেন, তখন সমস্ত আদালত পাথর নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই নীরবতা ভেদ করে একটি মৃদু গুঞ্জন শূন্যে দোল দিতে থাকে। জজ সাহেব কাঠের হাতুড়ি পিটিয়ে অর্ডার, অর্ডার উচ্চারণ করতেই সেই গুঞ্জন আবার শূন্যেই মিলিয়ে যায়। জজ সাহেব অধোমুখ কালো কুচকুচে দাড়িভরতি মুখের তরুণ আসামির দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি কিছু বললে বলতে পারেন।

আসামি ঘাড় তুলে জজ সাহেবের দিকে তাকায়। বেদনায় ভারাক্রান্ত দুটি চোখ। বন্দরে নোঙর ফেলা জাহাজের ক্লান্ত নাবিকের মতো সেই চোখে তামান্না সুলতানা হঠাৎ করে উদয় হয়। এ কোন জায়গা? হঠাৎ ছায়াছবির মতো একটা দৃশ্য মিনহাজের চোখে ভেসে ওঠে। ময়মনসিংহের কলেজ রোড। সরু রাস্তা। একটা রিকশা আসছে। রিকশায় বসা তামান্না। আহা কী রূপ! মুখের আদলটাও কেমন মায়াবী। স্বপ্নে দেখা কোনো রাজকন্যার মতো। কিন্তু সেই মায়াবী মুখের আড়ালে আরেকটি ডাইনিকে দেখে মিনহাজ। সেই ডাইনির চোখদুটি টানা টানা। যে চোখের দৃষ্টিতে আছে বিষ। সেই বিষে জর্জরিত হয় মিনহাজের মতো হাজারো যুবক। সেই ডাইনির বুকে আছে কামনার হুল। সেই হুলের বিষে ছটফটায় মিনহাজরা। না সেই ডাইনিকে আর বাঁচতে দেওয়া যায় না। মিনহাজের ভেতরটা লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু না, ডাইনিকে বুঝতে দেওয়া যাবে না। ডাইনিকে ভুলতে হবে। নইলে যে আর নাগাল পাওয়া যাবে না। মিনহাজ একটা প্রশ্রয়ের হাসি হাসে। সেই হাসিতে মায়াবিনী ধরা দেয়। চোখে রূপের ঝিলিক ছড়িয়ে মায়াবিনী রিকশা থেকে নামে। মিনহাজের কাছে আসে। মিনহাজ প্যান্টের পকেট থেকে সদ্য কেনা ভাঁজ করে ছোট করে রাখা যায় এমন কিরিচটা বের করে। চাবিতে টিপ দিতেই সাপের জিবের মতো রুপালি ঝিলিক দেওয়া কিরিচটা

ডাইনির চোখদুটিকে ঝলসে দেয়। তার চোখে ভয়ার্ত কাতরতা ভিড় করে। কিন্তু ডাইনির কাতরতায় ভুললে চলবে না। মিনহাজের চোখে ক্রুর উল্লাস খেলা করে। ঝপাৎ করে বসিয়ে দেয় কিরিচটা তামান্নার পেটে। একবার, দুইবার অনেকবার...

আসামি মিনহাজ আহমেদ কী এক আচ্ছন্নতায় ফ্যালফ্যাল করে জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকে। জজ সাহেব আবার বলেন, আপনার কি কিছু বলার আছে? বলার থাকলে বলতে পারেন।

সংবিৎ ফিরে পায় মিনহাজ। ভেতর থেকে কিছু বলার জন্য তাড়নাবোধ করে সে।

মাননীয় আদালত, দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকায় মিনহাজের গলা আড়ষ্ট, শ্লেষ্মা এসে কথা আটকে দিচ্ছে। সে গলা খাঁকারি দিয়ে শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে আবারও বলে মাননীয় আদালত, আমি তাকে বলেছি, তামান্নাকে আমি খুন করেছি। খুন করার সময়টিতে এবং তারপরেও মনে হয়েছিল খুন করে বেশ করেছি। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি, মানুষ হয়ে আরেকটা মানুষকে খুন করার কোনো অধিকার মানুষের নেই। তামান্না আমাকে প্রতারিত করেছে। এতদিন আমি তাই জেনে এসেছি। কিন্তু এখন জানলাম, আমি নিজেই তামান্নাকে প্রতারিত করার সব রাস্তা করে দিয়েছি। তামান্নার রূপ ছিল, কিন্তু তার সেই রূপ তাকে আত্মমর্যাদা দেয়নি, দিয়েছে অহংকার। সেই অহংকারের মৌসুমি বাতাসে রিপুর ঝোপঝাড় বাসনার বৃষ্টিতে তরতর করে বেড়েছে। তার শালীনতা খেয়েছে। সমবোধ খেয়েছে, সে হয়ে গেছে প্রবৃত্তির শাসিত একটি জীব। রূপের ছলাকলায় সে নারী থেকে হয়ে গেছে মায়াবিনী। কিন্তু পরিচিত বলয়ে তাকে ভালো মানুষই সেজে থাকতে হতো। সেই রকম ভালো মানুষ, আজকালকার তথাকথিত আধুনিক মেয়েরা যেমন থাকে। পার্লার, মার্কেটিং আর পরচর্চার মতো মামুলি বিষয়গুলোই তার বাসনাবিস্তারের অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়, যা আজকালকার অধিকাংশ মেয়েরই হয়। কিন্তু মনের গোপন কুঠুরিতে কামনার ঝোপঝাড়ের ভেতরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে প্রবৃত্তির শ্বাপদরা। ধর্মচর্চা সেই শ্বাপদদের বিতাড়িত করতে পারত। কিন্তু তামান্না সে পথে যায়নি। ফলে তার ভেতরের বন্য বলশালী প্রবৃত্তির চাওয়াকেই জীবনের দাবি বলে জেনেছে। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছুর পেছনেই ছিল প্রবৃত্তির সেই চাওয়া। সেই চাওয়া তামান্নার অগোচরে সভ্যতা, মানবতা, শিষ্টাচারের মতো জগৎপ্রভুর আরোপিত বিধানগুলোকে আড়াল করে দিয়েছে, যা আজকাল অনেককেই

দেয়। ফলে তামান্নার বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে। প্রবৃত্তির শ্বাপদ তার জ্ঞানকে দখল করে নেয়। ফলে সে সত্য, সুন্দর গুণগুলোকে চিরতরে হারিয়ে ফেলে। তার সুখ-দুঃখের ইতিহাস বদলে যায়। প্রেম-ভালোবাসার মতো মহত্তর জীবনবোধকে সে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মানুষের বুকে প্রেম-ভালোবাসা পাওয়ার লোভ শাশ্বত প্রেমই মানুষকে পূর্ণ করে, জীবনের আলোকিত আঙিনায় প্রেমই মানুষকে পথ দেখায়। কিন্তু তামান্নার বাসনা তাকে উলটো পথে নিয়ে যায়। তৃষ্ণার্ত মরুচারীর মতো সে কেবল মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়।

মাননীয় আদালত, মানবজীবনের একটা দাবি আছে, একটা লক্ষ্য আছে। পশুর মতো খেয়ে, সঙ্গম করে আরও কিছু পশুর মতো জীব সৃষ্টি করে মরে যাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি। স্রষ্টার এই প্রকৃতি থেকে শুরু করে সমাজ-সংসার, সভ্যতা, মানবতা জগতের পরিবর্তনশীল সবকিছুই সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করার মধ্যেই মানুষের প্রতিনিধিত্বের বিকাশ। কিন্তু আমরা কি তা করছি? আমরা ভোগ আর উপভোগের তাড়নায় অধিক উৎপাদনের নেশায় স্রষ্টার দেওয়া প্রকৃতির ভারসাম্যের ভাষাটি বুঝতে না পেরে পৃথিবীকে ক্ষতবিক্ষত করছি। মাননীয় আদালত, রিপুর তাড়নায়, অধিক উৎপাদনের নেশায় যারা পৃথিবীর বুকে ছুরি চালিয়ে পৃথিবীকে রক্তাক্ত করছে, তারা কী অপরাধী নয়? তারাও কিন্তু পৃথিবীর বৈচিত্র্যতায় ভারসাম্যটি বোঝেনি। পৃথিবীতে শিল্পবিপ্লব হলো, মানুষের লোভ বাড়ল, মানুষ পশু হতে থাকল, সেই লোভ পৃথিবীকে ক্ষতবিক্ষত করল। আজ মানুষের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন, তখন শেয়ালের মতো সবাই গেল গেল বলে একযোগে হুক্কাহুয়া দেওয়া শুরু করল। মাননীয় আদালত, স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের জন্য পৃথিবীর ভারসাম্যের ভাষাটি জানা উচিত ছিল। সেই ভারসাম্যকে বজায় রেখে প্রগতি আসা উচিত ছিল। এখনো সাগরের নিচে, মরুভূমিতে পরমাণু অস্ত্র থেকে শুরু করে কত ধরনের অস্ত্রের পরীক্ষা চলছে, পৃথিবীকে করা হচ্ছে ক্ষতবিক্ষত। আমরা সেই রক্তক্ষরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে এখনো কিছু জানি না। কিন্তু একদিন যখন জানব, তখন দেখব আমরা বিনাশের তলানিতে যেয়ে ঠেকেছি।

মাননীয় আদালত, মানুষ প্রকৃতি থেকে আলাদা নয়। প্রকৃতিকে যেমন জীবনের কল্যাণে চাষাবাদ করতে হয় তেমনই মানুষের ভেতরেও মনুষ্যত্বের ফসল ফলাতে চাষ করতে হয়। উত্তম চাষি যেমন তার জমিনকে কর্ষণের ফরমুলা জানে, তেমনই একজন উত্তম মানুষও মানবজমিনকে চাষাবাদ করার পদ্ধতি জানেন। সেই পদ্ধতিটি হলো ধর্মের বিধান। কিন্তু তামান্না তা জানত না, আমিও

জানতাম না। তাই তো তামান্নাকে সেই অজ্ঞতার দায় শোধ করতে হয়েছে জীবন দিয়ে আর আমাকেও তা শোধ করতে হবে জীবন দিয়েই। তবে আমার চেয়ে তামান্নার ক্ষতির পাল্লাটি বেশি ভারী। তামান্নার আর সেই চাষাবাদের ফরমুলাটি জানার সুযোগ নেই। আমিই তার সেই সম্ভাবনাটি নষ্ট করে দিয়েছি। আজ যেমন আমি অনুতাপের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে নিজের জীবন ঘষে আগুন জ্বালিয়েছি এবং সেই আগুনের ফুলকিতে জীবনের অন্ধকারকে সনাক্ত করতে পারছি, হয়তো বেঁচে থাকলে তামান্নাও সেই সুযোগ পেলে পেতেও পারত। তামান্নার সেই সম্ভাবনাকে ধ্বংস করার জন্য সত্যিই আমি অপরাধী। আমার অপরাধের কোনো সীমা নেই। মানুষের তৈরি আদালতে যেমন, তেমনই আল্লাহর আদালতেও। কিন্তু আল্লাহ মহান। তিনি যে-কাউকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু মানুষের তৈরি আদালতের সীমাবদ্ধতা আছে। এখানে আইনের ধারা দেখেই সবকিছু করতে হয়। ব্যক্তিগত সহানুভূতির কোনো সুযোগ এখানে নেই। তাই এই আদালতে আমি শাস্তি মওকুফের কোনো আবেদন জানাব না। কিন্তু আল্লাহর আদালতে জানাব। মাননীয় আদালত, আমাকে যে শাস্তিই দেওয়া হোক, আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু তামান্নার পরিবার এবং এই আদালতের কাছে আমি একটি অনুরোধই করতে চাই— দুনিয়ার আদালতে শাস্তি পাওয়ার পরও কেউ যেন আমার প্রতি বিদ্বেষ না রাখেন। আসলে মানুষ খুব অসহায় দুর্বল প্রাণী। আল্লাহ হেফাজত না করলে যে কারও পক্ষেই সীমা অতিক্রম করা সম্ভব। কিন্তু ওই সময়টিতে আমি আল্লাহর হেফাজত চাইনি। চাইলে আজ আমাকে এই আদালতে লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকতে হতো না। আপনারা সবাই আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন।

একদমে কথাগুলো বলে মিনহাজ ঢুকরে কেঁদে ওঠে। তার বাবা-মা-বোন শব্দ করে কাঁদে। জজ সাহেবের চোখটাও ভেজা ভেজা ঠেকে। তিনি সামনের তারিখে রায় দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে আদালত মুলতবি করে দিয়েছিলেন। সেই রায় হবে আজ। আসামি মিনহাজ পাথুরে চোখে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা মৃদু গুঞ্জন হলো। ঘরটিকে আলোড়িত করে। জজ সাহেব কাঠের হাতুড়ি পিটিয়ে বলেন, অর্ডার! অর্ডার!

আদালত আবার নিস্তব্ধতার চাদরে ঢেকে যায়। জজ সাহেব ফাইল খুলে রায়ের কপিটি বের করেন। জজ সাহেব মামলার রায় পড়তে থাকেন। তারপর এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আদালত আসামির সাম্প্রতিক জীবনভাবনাকে শ্রদ্ধা করে এবং এও মনে করে যে, আসামির এই পরিবর্তিত জীবনবোধ মুক্ত

সমাজের মানুষের জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয়। আদালত এও মনে করে যে, এই জীবনবোধ ধারণ করে আসামি মুক্ত সমাজে বিচরণ করতে পারলে মানবতার উন্নতি সাধিত হতো। কিন্তু আদালত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, আইনের ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা আদালতের নেই। আসামির নিজ মুখের স্বীকারোক্তি এবং অন্যান্য আলামত বিশ্লেষণ করে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আসামি মিনহাজ আহমেদ হত্যার উদ্দেশ্যেই নিহত তামান্না সুলতানাকে ছুরিকাঘাত করেছে এবং এই আঘাতের কারণেই তামান্না সুলতানার মৃত্যু হয়েছে। আত্মরক্ষার্থে এবং সাময়িক উত্তেজনার বশে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২ ধারামতে এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং সর্বনিম্ন শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। আইনের ধারামতে আসামিকে মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত করা যায়। কিন্তু আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিষ্ঠুরতা নয়, বরং মানবতার বিকাশ। মানুষের জীবন একটা বিশাল সম্ভবনার ক্ষেত্র। মৃত্যু সেই সম্ভবনাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়। আসামির সাম্প্রতিক জীবনবোধ যে কারও জন্য অনুসরণীয়, তার অকপটতা আদালতকে এই প্রেরণা দেয় যে, আসামির বলা কথাগুলো তার মনেরই কথা। তদুপরি আসামির বয়স কম। আসামির এই সকল দিক বিবেচনা করে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আসামির জীবনের বিশাল সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াটা উচিত নয়। এজন্যই সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রহিত করে আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

রায় পাঠ শেষ করেই জজ সাহেব তার খাস কামরার দিকে পা বাড়ান।

দুই.

কিছুই ভালো লাগছে না বিউটির। সবাই অবশ্য তাকে বিউটি কুইন বলে ডাকে। কিন্তু অতটা তার মন সায় দেয় না। তাই সে বিউটিতেই খুশি। এই বিউটি নামের একটা ইতিহাস আছে। তিন মাস আগে তারা বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুল থেকে এখানে এসেছে পিটিআই ট্রেনিং করতে। ১০ মাসের কোর্স। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের জন্য বাধ্যতামূলক। ট্রেনিং শুরুর চতুর্থ দিনই এক সিনিয়র রসিক ভাই তাকে বলে, মাশাল্লা আমাদের মধ্যে একজন বিউটি কুইনও আছে।

সেই থেকেই সে বিউটি নামেই ট্রেইনারদের কাছে পরিচিতি পেয়েছে। বিউটি সুন্দরী। কিন্তু তার সুন্দরের স্নিগ্ধতার চাইতে চটক বেশি। আর এর জন্যই তাকে

খাটাখাটুনিটা একটু বেশিই করতে হয়। হালফ্যাশনের পোশাক, রকমারি প্রসাধনী আর মাসে একবার বিউটি পার্লারে গমন তার সৌন্দর্যের মূল কারিগর। চাকুরির বেতনের অর্ধেকটাই যায় এসব করতে। কিন্তু এর জন্য কোনো খেদ নেই বিউটির। পুরুষের মুগ্ধতা আর সহকর্মীদের ঈর্ষা তার খেদ জুড়িয়ে দিয়ে মনটাকে রাঙিয়ে যায়। তার পথ চলা মাটিতে ভর দিয়ে চলা নয়, বাতাসে ভেসে চলা।

হোস্টেলে যে রুমটিতে সে থাকে, তাতে আরেকজনও থাকে। বাচ্চা মেয়ে। গত বছর চাকুরি হয়েছে। বিয়ে থা হয়নি। কিন্তু মেয়েটির মধ্যে কুমারীসুলভ কোনো চপলতা নেই। বয় ফ্রেন্ড তো নেই-ই, মোবাইল ফ্রেন্ডও নেই। যা আজকালকার দিনে লেখাপড়া জানা মেয়েদের জন্য একটা অসম্ভব ব্যাপার। আসলে প্রযুক্তি মানুষকে নতুন গতি দিয়েছে। এই যে মোবাইল, একমুঠো একটা যন্ত্র, কিন্তু এই একমুঠো যন্ত্রটাই মানুষের জীবনবোধকে পর্যন্ত পালটে দিয়েছে। মোবাইলের বদৌলতে প্রতিটি মেয়েরই এখন মোবাইল ফ্রেন্ড আছে। এমনকি বিবাহিতাদেরও অনেকের আছে। মানুষকে এখন আর একগুঁয়েমিতে পায় না। বোরিং লাগলেই লাগাও ফোন। মোবাইল ফ্রেন্ডদের কাউকে না কাউকে তো পাওয়া যাবেই। আর এফএনএফ এর সৌজন্যে সস্তায় কথা বলো যতক্ষণ না একগুঁয়েমি কাটে। আর কথার বিষয়ও হতে পারে বিচিত্র। শরীরের অস্তিসন্ধি থেকে শুরু করে লাভ, সেক্স সবকিছুই হতে পারে কথার বিষয়। এভাবেই মোবাইল দ্রুত মূল্যবোধকে পালটে দিচ্ছে।

কিন্তু বিউটির রুমমেট শারমিন একটি জেনুইন খ্যাতমার্কা মেয়ে। পড়া-শোনা, খাওয়া, নামাজ আর ঘুম—এই হলো এই অকালপক্ক মাস্টারনির জীবনের পরিধি। বাইরে বেরোয় আবার বোরকা পরে। এরকম একটি রসকষহীন কুমারী মেয়ে বিউটির রুমমেট হওয়াটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী? তবে খুব নিরীহ, গরুর মতো স্বভাব মেয়েটির। রাত ১০টা বাজলে গরুর মতো পড়ে পড়ে ঘুমায় আর ভোর হতেই পড়ালেখার জাবর কাটা শুরু করে দেয়। প্রথম প্রথম বিউটিকে পড়া নিয়ে বেশ বিরক্ত করত। কিন্তু এখন আর করে না। বিউটি অবশ্য খাতাপত্র উলটায় না যে তা নয়, মাঝে মাঝে সেও উলটায়। পড়ালেখা করে সে টিও ডিও হবে না। নেহায়েত করতে হয়, তাই করা।

শারমিন আজ বিকেলে বাড়ি গেছে। ওকে দেখতে আসবে। পছন্দ হলে বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে যাবে। লাজুক রাঙা হয়ে শারমিন এসব কথা তাকে বলেছে। বিউটি অবশ্য তাকে আশ্বস্ত করেছে। বলেছে, দেখো এইবার ঠিক লেগে যাবে।